আছে পান্থধাম

লোকোত্তর পুরুষ স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

মিতা মজুমদার

পূজনীয় লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজের জীবনের মূল সুর ছিল অদ্বৈতভাব। এই পরিবর্তনশীল জগতের পিছনে যে এক অপরিবর্তনীয়, শাশ্বত সত্তা আছে—এই বোধে প্রতিষ্ঠিত দেখেছি তাঁকে। তাঁর চিন্তাভাবনায়, কথায়, জীবনযাত্রায় এই ভাবটিই সর্বদা স্ফুরিত হত। দু-একটি দৃষ্টান্ত দিই। মহারাজের ছোটভাই, আমাদের কেষ্টদা, দেহত্যাগ করেছেন। খবরটা শুনে ভারাক্রান্ত মনে মহারাজের কাছে গিয়ে সে-প্রসঙ্গ তুলতেই মহারাজ বললেন, "All fun, all fun! দেখো, নারদ ভগবানের কাছে বসে আছেন। হঠাৎ খুব জোরে শব্দ হল। নারদ ভগবানকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ কীসের শব্দ?' ভগবান বললেন, 'রাবণ জন্মাল।' পরমুহূর্তেই আবার প্রচণ্ড শব্দ। নারদ জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ আবার কীসের শব্দ?' ভগবান বললেন, 'রাবণ মারা গেল।' দেখো, যো সো করে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করলেই বোঝা যাবে যে জীবন-মৃত্যু কোনওটাই কিছু নয়। আমি এক, অদ্বিতীয় সত্তা। আমিই সব, সবই আমি। যেমন এক আমাকে ঘরের বহু আয়নায় বহু দেখায়, তেমনি। সিনেমা দেখলে কি কাঁদ? স্বামীজী বলতেন, 'এও তো সিনেমা। ছায়াবাজি।' "

মহাপুরুষ মহারাজের দৃষ্টান্ত দিয়ে মহারাজ বলতেন, তাঁর রোগাক্রান্ত শরীর কিন্তু সর্বদা দিব্যানন্দে বিভোর হয়ে থাকতেন। ঘুম প্রায় নেই। স্বামী অপূর্বানন্দজী শরীরের কথা জিজ্ঞাসা করলে মহাপুরুষ মহারাজ বলতেন, ''শরীরের জন্য কোনও চিন্তা নেই; যে-সাধু শরীরের জন্য ব্যস্ত, মরতে ভয় করে সে সাধুই নয়। I am always ready for His call. গুরুকৃপায়

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের স্বনামধন্য লেখিকা

।৯০।

পাকা জ্ঞান হয়ে গিয়েছে যে, এ শরীরটা আমি নই।'' অন্য সময় মহাপুরুষ মহারাজ বলেছিলেন, ''আজকাল একটা ভারি মজা দেখছি। এটাকে (শরীরকে) অবলম্বন করে দুটো ব্যাপার চলছে—একটা শরীরের আর একটা আত্মার। শরীরের দিক থেকে নানা ব্যাধি ইত্যাদি, আর আত্মার দিক থেকে নির্মল আনন্দ—বেশ আনন্দ হয় দেখে আর ভেবে।'' এইভাবে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের মনেও পরম সত্যটি গেঁথে দেওয়ার চেষ্টা করতেন মহারাজ।

১৯৯৫ সালের ৪ এপ্রিল একটি চিঠিতে লিখছেন, ''কালীদা [শ্রীশ্রীমার মন্ত্রশিষ্য স্বামী আদিনাথানন্দজী] মহারাজ চলে গেলেন। শুনলাম মৃত্যুর পর তাঁকে খুব উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। সাধুর মৃত্যু মানে মৃত্যুকে জয়।''

পরম সত্যে প্রতিষ্ঠিত মহারাজের পূত সান্নিধ্যে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের মনও জাগতিক দুঃখকষ্টের ঊর্ধ্বে আনন্দময় জগতে চলে যেত। এমনই ছিল তাঁর কথার শক্তি, মহিমা। আমাদের পরিচিত বেশ কিছু মানুষের তীব্র শোক, নিদারুণ যন্ত্রণাও তিনি এই সত্যের আলো দিয়ে শান্ত করেছেন। তাঁরা আবার প্রশান্তমনে ঈশ্বরচিন্তায় মনোনিবেশ করেছেন।

'বিবেকচূড়ামণি' ক্লাসে মহারাজ শান্ত, আত্মস্থ হয়ে ওই সুউচ্চ তত্ত্ব সহজ সরলভাবে সকলের মনে গেঁথে দিতেন। বলতেন, ''আমি আপনাকে দেখছি, দুই দেখছি। তাই কখনও প্রীতি, কখনও কলহ—এই দেহে আত্মাভিমান করছি। কেউ প্রশংসা করলে আনন্দে গদগদ হচ্ছি, নিন্দা করলে চটে যাচ্ছি। মানুষ আত্মপ্রশংসা করতে এবং শুনতে ভালবাসে। এই ভুল আমরা করে আসছি। তাই শাস্ত্রপাঠ, সাধনা, তপস্যা অনবরত করতে হবে এবং ভাবতে হবে আমি মুক্ত, মুক্ত, মুক্ত। শাস্ত্র বলে, আমরা যে দুঃখে আছি এটাই অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। আমরা আনন্দস্বরূপ। তুমি মুক্ত। অথচ মনে করছ তুমি সর্বদাই একটা প্রতিকূলতার মধ্যে আছ। এটাই অজ্ঞতা। একবার কামারপুকুরে গেছি। তখন সেখানে ইলেকট্রিসিটি ছিল না। জ্যোৎস্না রাত। বাইরে বেরিয়ে দেখি ঘোমটা দেওয়া একটি বউ মাথা নাড়ছে। চমকে উঠলাম। ভাবছি—এ কী করে সম্ভব? তারপর কাছে গিয়ে দেখি একটা কলাগাছ। এই হচ্ছে 'ভ্রান্তা মোহিতকল্পনা'। বুদ্ধির ভুলে নিজেকে জীব ভাবছি। অজ্ঞানতায় নিজেকে খণ্ড মনে করছি। আমি ব্রাহ্মণ, এই সুন্দর দেহ আমার। আমি পণ্ডিত, ধনী—অজ্ঞানতা থেকে এসব ভাবছি। মায়া স্বরূপ আবৃত করে দেয়। আসলে আমি সেই পরমাত্মা। এসব আমাদের জানা দরকার, ভাবা দরকার। বারবার এসব চিন্তা করতে হয় । ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর সাহায্য নিয়ে, সাধুসঙ্গ করে, তপস্যা করে এ-জন্ম সার্থক করে তুলতে হয়।'' বলতেন, ''সর্বদা ব্রহ্মাকারা বৃত্তি তুলতে হয়, ব্রহ্মমনস্ক হতে হয়।'' মহারাজের বিশেষ প্রিয় কিছু শব্দ ছিল—'তদ্গত', 'তন্ময়', 'কৃতকৃত্য', 'সাক্ষী', 'আপ্তকাম', 'আত্মারাম' ইত্যাদি। মহারাজ নিজেও আত্মারাম হয়ে থাকতেন, আত্মানুভূতির আনন্দে ভাসতেন। ১৯৯৬ সালের ২৬ নভেম্বর একটি চিঠিতে আমাকে লিখছেন, ''মা আমার, আমার শরীর ভাল নেই, মন কিন্তু ভাল আছে। মাঝে মাঝে কোন লোকে চলে যাই জানি না। সেখানে অন্ধকার নেই, শুধু আলো। আমি নিজের আলোর সঙ্গে মিশে গেছি। আমার 'আমি' নেই, আমি বলে কিছু খুঁজে পাই না। শরীর নেই, মন নেই, বুদ্ধি নেই, শুধু একটা বোধ।''

স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত মহারাজ আনন্দঘনমূর্তি ।৯১।

হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর দর্শনমাত্রেই মানুষের মন এক অপার্থিব আনন্দে ভরে যেত। সকলের মধ্যে তিনি নিজেকে দেখতেন, আবার সকলকে নিজের মধ্যে দেখতেন। তাই দেশ, কাল, জাতি, ধর্ম, মানুষ, জীবজন্তু ইত্যাদি নামরূপের সকল গণ্ডি ভেঙে গিয়েছিল তাঁর কাছে। সমদর্শী হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু পরমতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েও জগতকে অস্বীকার করেননি কখনও। মানুষকে তার স্বধাম পরব্রহ্মে স্থিত হওয়ার জন্য যেমন নিরন্তর উদ্বুদ্ধ করে যেতেন, তেমনি মানুষের ক্ষুদ্র জাগতিক দুঃখকষ্ট, শোকতাপেও বিচলিত হতেন; সর্বশক্তি দিয়ে তাদের দুঃখ লাঘব করার চেষ্টা করতেন। একদিন একজনকে মহারাজ বলছেন, ''এত লোকের সঙ্গে পরিচয় না হলেই বোধ হয় ভাল হত। মানুষের এত দুঃখ! প্রতিদিনই আমাকে কারও না কারও দুঃখের কথা শুনতে হয়। তাই আমি কোনওদিনই ভাল থাকি না, বুঝলে।'' সবার কষ্টকে তিনি নিজের কষ্ট বলেই মনে করতেন। ছোটবেলায় ক্লাসে শিক্ষক অন্য কোনও ছাত্রকে মারলে মহারাজ কাঁদতেন। শিক্ষক তাই দেখে অবাক হয়ে বলতেন, ''তুমি কাঁদছ কেন? তোমায় তো মারিনি!'' এই হৃদয়বত্তা নিয়েই জন্মেছিলেন তিনি। তবে অন্যের দুঃখ সহ্য করতে না পারলেও জগতের কঠিন প্রতিকূলতাকে শান্তভাবে সহ্য করার বিরাট ক্ষমতা ছিল মহারাজের। একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে তিনি একবার বলেছিলেন, ''মনে রাখবেন, যখনই আপনি উত্তেজিত হচ্ছেন তখনই আপনি বিপক্ষকে জমি ছেড়ে দিচ্ছেন।'' তাই প্রয়োজনে কঠোর হলেও কখনও অভদ্র আচরণ করেননি তিনি। আবার শারীরিক কষ্টও মুখ বুজে সহ্য করতেন। একবার গলব্লাডার অপারেশনের পর মহারাজকে বলা হল, ''একদম কাশবেন না। তাহলে সেলাই ছিঁড়ে যাবে।'' রাত্রিবেলা মহারাজের কাশি হল। ডাক্তার, নার্স কেউ ধারে কাছে নেই। একসময় সেলাই ছিঁড়ে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে পড়ল। সারারাত ওইভাবে কাটল। সকালে নার্স ঘরে ঢুকে ওই দৃশ্য দেখে সঙ্গে সঙ্গে পেটটা ঢেকে দিয়ে ভর্ৎসনার সুরে বললেন, ''কী, আপনি নাড়িভুঁড়ি দেখেননি তো?'' মহারাজ মজা করে বলেছিলেন, ''বা রে, আমার নাড়িভুঁড়ি আমি দেখব না তো কি তুমি শুধু দেখবে?'' পরে এই কথা বলতেন আর হাসতেন, যদিও এই সেলাই ছিঁড়ে যাওয়ার ফলে মহারাজকে তখন তো বটেই, তারপরেও অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল।

এই মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে ১৯৯৬ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর আমাকে লেখা একটি চিঠিতে: ''মা আমার, আমার কী হয়েছে আমিই জানি না। কে বা কারা যেন সব সময়েই আমাকে ঘিরে রয়েছে। শত্রু নয়, বন্ধু, হিতৈষী। কত আদর-যত্ন পাই। আমাকে আগলে রয়েছেন তাঁরা। মন আমার কোথায় থাকে খুঁজে পাই না। একটা ভীষণ পরিবর্তন আসছে বুঝতে পারছি।... মাকে সব সময়েই পাই।''

জীবনের শেষ বেলায় এই সূক্ষ্মশরীরী বন্ধুরা অসুস্থ, বৃদ্ধ মহারাজের অনেক সেবা করতেন। মহারাজ বলতেন, ''আমার সঙ্গে সূক্ষ্মদেহে যারা থাকে তারা আবার আমার নানা কাজ করে দেয়। মাঝরাতে সুইচটা পাচ্ছি না। হাতড়াচ্ছি এমন সময় কেউ একজন লাইট জ্বেলে দিল। আবার রাতে শীত শীত করছে, এদিকে চাদরটা পায়ের কাছে চলে গেছে। আমি পা দিয়ে তুলতে পারছি না, কেউ হঠাৎ চাদরটা টেনে আমায় ঢেকে দিল। রাতে ঠান্ডা লাগছে, পাখাটা বন্ধ করার দরকার, এমন সময় কেউ পাখাটা বন্ধ করে দিল। বিছানা

।৯২।

থেকে উঠতে গিয়ে অনেক সময় বেসামাল হয়ে যাই, তারা আমায় সাহায্য করে। এত সেবা, এত ভালবাসা! আমি তাদের সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ দিই! আবার অনেক সময় মা-ও আসেন।''

মহারাজকে নির্দিষ্ট কোনও বিশেষণে বিশেষিত করা যেত না। যখন তিনি জ্ঞানের কথা বলতেন, তখন সেই বিষয়ে এমনভাবে ডুবে যেতেন যে মনে হত তিনি জ্ঞানযোগী। তাঁর আচার-আচরণেও জ্ঞানীর ভাব পরিস্ফুট হয়ে উঠত। আবার তিনি যখন সিংহবিক্রমে কর্ম করতেন, কর্মযোগের কথা বলে সকলকে উদ্দীপিত করতেন, তখন মনে হত তিনি নিখাদ কর্মযোগী, শুধু নিষ্কাম কর্মেই বিশ্বাস করেন। আবার তিনি যখন ভক্তির কথা বলতেন, তখন শ্রোতাদের হৃদয় ভক্তিভাবে উদ্বেলিত হয়ে উঠত। সেসময় তাঁর প্রেমানুরঞ্জিত রক্তাভ মুখমণ্ডল দেখে মনে হত ভক্তশ্রেষ্ঠ এই মহাপুরুষ বুঝি ভগবানের মধ্যে গলে মিশে গিয়েছেন। বস্তুত মৌচাক দেখে যেমন বিভিন্ন ফুলের পরিচয় জানা যায় না, তেমনি সিদ্ধ মহাপুরুষের চরিত্রে সব ভাব এমনভাবে সমন্বিত হয়ে যায় যে তাঁকে কোনও গণ্ডির মধ্যে ফেলা যায় না।

ভগবানকে একান্ত আপনার মনে করা, ভগবানকে ভালবাসা, ভগবানকে কেন্দ্র করে জীবনের পথ চলা—ভক্তের এই লক্ষণগুলি শৈশবেই মহারাজের চরিত্রে ফুটে উঠেছিল। মহারাজের মামাবাড়ি কেঁড়াগাছিতে (বাংলাদেশে খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমায়) খুব প্রাচীন, খুব জাগ্রত একটি রামমন্দির ছিল। মন্দিরে শ্রীরামচন্দ্র, সীতাদেবী, লক্ষ্মণ ও মহাবীরের অপরূপ সুন্দর দারুমূর্তি। শ্রীরামচন্দ্রকে কেন্দ্র করেই তরুণ শিবপদর জীবন তখন আবর্তিত হত। ভোরবেলা কাঁসর-ঝাঁঝের আওয়াজে তাঁর ঘুম ভাঙত। শ্রীরামচন্দ্রের মঙ্গলারতি, তারপর বাল্যভোগ, দ্বিপ্রাহরিক ভোগ, সন্ধ্যারতি এবং রাতে শয়ন। শ্রীরামচন্দ্রের পূজার ছন্দে ছন্দে তাঁর জীবন ছন্দিত হত। তাঁকে চিঠি লিখে মন্দিরে গুঁজে দিয়ে আসতেন। প্রার্থনা করতেন, ''যেন পরীক্ষায় ফার্স্ট হই আর ভাল সাধু হতে পারি।'' সাধু হওয়ার আগে যুবক শিবপদ কেঁড়াগাছিতে গিয়ে মন্দিরের শিকল খুলে রামচন্দ্রকে বলে এসেছিলেন, ''যদি ঠিকঠিক সাধু হতে পারি তবে জানব তুমি আছ। নইলে বুঝব সব মিথ্যে।''

দেশভাগের পর সেই বিগ্রহ এলেন মছলন্দপুরে। মহারাজ প্রায় প্রতিবছরই যেতেন সেখানে। ১৭ ডিসেম্বর ১৯৯৮, দেহত্যাগের দু-সপ্তাহ আগে রামচন্দ্রকে দর্শন করে এলেন। মহারাজের অসুস্থতার জন্য প্রথমে কেউই রাজি হচ্ছিলেন না যে তিনি অতদূরে যান। কিন্তু তাঁর ঐকান্তিক ব্যাকুলতার কাছে সবাইকে হার মানতে হল। প্রচণ্ড দুর্যোগ মাথায় নিয়েই রওনা হলেন সেদিন। মন্দিরে গিয়ে প্রাণভরে শ্রীবিগ্রহ দর্শন করলেন। নিজের হাতে তাঁদের মালা পরালেন, অর্ঘ্য দিলেন। রামনাম হতে লাগল, 'শুদ্ধ ব্রহ্ম পরাৎপর রাম...।' জোড়হাতে চোখ বন্ধ করে স্থির হয়ে শুনতে লাগলেন। দুচোখ বেয়ে আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়ছে, মুখে অপার্থিব দিব্য হাসি! অন্তরে ভক্ত ও ভগবানের মিলনোৎসব চলছে তারই বহিঃপ্রকাশ যেন। যতক্ষণ রামনাম হল ওইভাবে বসে রইলেন মহারাজ। শেষবারের মতো দর্শন করে এলেন তাঁর একান্ত আপনার জনকে, তাঁর সর্বস্বকে, যাঁকে তিনি প্রেমরজ্জু দিয়ে বেঁধে ফেলেছিলেন। ফিরে এসে বলেছিলেন, ''ভারি তৃপ্তি পেয়েছি। ইচ্ছে করছিল, রামজীকে জড়িয়ে ধরি।''

ক্রমশ

।৯৩।